পিদিমের নিচে

(গল্পগ্রন্থ – অসাধারণ)

একটিমাত্র গ্রামে আমার বাল্যে এই ধরনের এক ব্যক্তিকে আমি দেখেছিলাম। কেউ তার জীবনচরিত লেখেনি, কেউ জানেও না তাকে, কিন্তু আমি জানি এবং যতটুকু জানি বা নিজের চোখে দেখেছিলাম, লিখে রাখা উচিত ভেবে লিখে রাখলাম।

আমার ছেলেবেলায় দিনকতক মাসির বাড়িতে কাটিয়েছিলাম সে গ্রামে। আমার তখন বয়স ন-দশ বছরের বেশি নয়।

গঙ্গার ধারের পথ দিয়ে একদিন মাসতুতো ভাই নন্দর সঙ্গে পাশের গ্রাম আমিনপুরে চাল আনতে যাচ্ছিলাম। বিকেলবেলা, বর্ষাকাল, গঙ্গার জলে খুব ঘোলা এসেচে, জল বেড়ে সাতনলির বড় চড়া ডুবে গিয়েচে, ঝিঙে-পটলের ক্ষেত জলের অত্যন্ত ধারে এসে পড়েচে।

হঠাৎ নন্দ আমায় ধমক দিয়ে বললে—এই, সরে আয় !

—কি রে ?

আমার মুখ থেকে কথা বেরুতে না বেরুতে ঝুপ করে অনেকখানি পাড় ভেঙে পড়ল অনেক নিচে ঘোলা জলের আবর্তের মধ্যে। আমার শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল।

নন্দ বললে—এখুনি গিইছিলি যে !

সত্যই তাই। আর একটু হলে আমি গিয়ে পড়তাম গঙ্গাগর্ভে। তখন সাঁতার জানতাম না। জলে পড়লে আর বাঁচবার উপায় ছিল না। আমার বড় ভয় হল, গঙ্গার ধার বেয়ে বেয়েই রাস্তা অনেক দূর চলে গিয়েচে। যদি আবার পাড় ভাঙে, বিশ্বাস কি !

নন্দকে বললাম—নন্দদা, আমি যাব না, তুই যা। আমি বাড়ি যাই বলেই—স্বীকার করতে এখন লজ্জা হয়, কেঁদে ফেললাম।

নন্দ কাছে এসে বললে—ওই দ্যাখো, নাও, কেঁদে উঠলি কেন ?কি মুশকিলেই পড়া গেল দ্যাখো ! বাড়ি যেতে পারবি নে একলা, চল তোকে পাগল ঠাকুরের আস্তানায় রেখে আসি।

এইভাবে এই অদ্ভুত লোকটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটল।

এ অঞ্চলে আমি আছি আজ মাস দুই। পাগল ঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনে আসচি এতদিন। শুনেছিলাম প্রথম আমার মাসিমার মুখে। আমি বলেছিলাম—সে কে মাসিমা ?

—গঙ্গার তীরে থাকে। সাতনলির চরের এপারে।

—কে সে ?

—জেতে বুনো। ওখানে আস্তানা করে আছে ঘর বেঁধে আজ বিশ-ত্রিশ বছর। আমার তো বিয়ে হয়ে এখানে এসে এস্তক শুনে আসছি। অনেক ছোট জেতের গুরুদেব। মাঘ মাসে তার ওখানে মেলা বসে, লোকজন আসে, দোকানপসার জমে।

—আমি একদিন দেখতে যাব ?

—না, যায় না। বুনো বাগদি, ছোট জেতের কাণ্ড, সেখানে কি দেখতে যাবি তুই ?ছুঁলে যাদের গঙ্গাস্নান না করলে শুদ্ধ হয় না !

সেই বিকেলে আমার মাসতুতো ভাই নন্দ আমায় পাগল ঠাকুরের আস্তানায় বসিয়ে রেখে চলে গেল। বললে—ফিরে না আসা পর্যন্ত বসে থাকবি—

একটা বাবলা বনের মধ্যে দুখানা খড়ের ঘর। একটা ছোট গোয়ালঘর, তাতে দুটি গাই-গরু বাঁধা। একখানা ঘরের দাওয়া অত্যন্ত নিচু, সেখানে খানকতক পিঁড়ি আর খেজুরের চেটাই পাতা। বাবলা গাছে ফুল ধরেচে, ফুল

ঝরে ঝরে নিকোনো পুঁছোনো পরিষ্কার উঠোনটা ছেয়ে রেখেচে। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গোয়ালঘরে ঘুঁটের সাঁজাল দিচ্ছে। আর কেউ কোথাও নেই।

এমন সময় একটি লোক বাবলা বনের ওধার থেকে বড় ঘরখানার দাওয়ায় এসে একখানা দা রেখে দিলে। তার কাঁধে এক বোঝা সবুজ জোলা ঘাসের আঁটি। লোকটার লম্বা দাড়ি বুকের উপরে পড়েচে, মাথায় লম্বা লম্বা জট পাকানো চুল, পরনে অতি মলিন এক কাপড়—দেখে পাগল বলে মনে হয়।

লোকটা আমাকে লক্ষ্য করে বললে—কে ওখানে ?কে গা ?

আমার ভয় হয়েচে। আমি আমতা আমতা করে বললাম—এই—এই—ওই আমার মাসির বাড়ি—

সেই বৃদ্ধা বললে—বাঁওনদের ছেলে ?বোধ হয় বাবুদের বাড়ির। ভূপেনবাবুর নাতি নন্দ বসিয়ে রেখে গেল ?ভয় কি খোকা ?ভয় কি ?শসা খাবা ?

শসা খাব কি, লোকটার হাবভাব ও রক্তবর্ণ বড় বড় চোখ দেখে আমার প্রাণ তখন উড়ে গিয়েচে। আমি কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি। দস্যু-ডাকাতের গল্প শুনেচি, সেই দস্যু-ডাকাতদের একজন নয় তো ?

হঠাৎ লোকটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললে—ভয় কি, বাবাঠাকুর ?ভয় কি ?কিছু ভয় নেই, বোসো।

তারপর একেবারে কাছে এসে অত্যন্ত মোলায়েম স্নেহের হাসি হেসে বললে—আহা বালক !

আমি চুপ করে বসে আছি। বোবার শত্রু নেই।

লোকটা বললে—নাম কি বাবাঠাকুর ?

ভয়ে ভয়ে বললাম—পতিতপাবন মুখোপাধ্যায়—

—পতিতপাবন ?বাঃ, বেশ বেশ। পতিতপাবন যিনি, তিনিও তোমার মতো। আহা-হা ! আহা !

লোকটা শেষের কথাগুলো কাঁদো কাঁদো সুরে জোরে জোরে উচ্চারণ করলে। তারপর বললে—ওগো, পতিতপাবনের ভোগ দেবে কি দিয়ে ?আমার বাড়ি এসেচেন দয়া করে, সে অদৃষ্ট করিনি যে বাবাঠাকুর ! তোমার ও-মুখে কি তুলে দেব ?পাকা তাল একটা নিয়ে যাও—তালের বড়া ভেজে দিতে বোলো তোমার মাসিমাকে—

আমার কথাগুলো ভালো লাগল এবং ভয়ও অনেক চলে গেল। কিন্তু ওর রকম-সকম দেখে মনে হল লোকটা পাগল ঠিকই। তাই ওকে পাগল ঠাকুর বলে।

পাগল ঠাকুর ছোট ঘরটার দাওয়ায় গিয়ে বসে আমায় কাছে ডাকলে। হাতছানি দিয়ে বললে—এসো পতিতপাবন, এসো এসো—

বৃদ্ধা বললে—ওকে ডেকো না, ভয় পেয়েচে।

কিন্তু আমি সম্প্রতি নির্ভয় হয়েচি দেখাবার জন্যে পাগল ঠাকুরের পাশে গিয়ে বসলাম।

পাগল ঠাকুর একখানা খেজুরের চেটাইয়ের উপর বসে এক কল্কে তামাক না গাঁজা কি সাজলে। আমায় বললে—তুমি বাঁওন ?

—হ্যাঁ।

—পায়ের ধুলো দেবে একটু ?

—আমায় ছুঁয়ো না। মাসিমা বারণ করেচে।

পাগল ঠাকুর হেসে উঠে বললে—কেন, নাইতে হবে বুঝি ?তা আমায় ছুঁলে তোমায় নাইতে হবে না। আমি বাঁওন নই, কিন্তু দয়াল গুরুর নামে থাকি। তিনি আমাদের সকলের চেয়ে বড়। দাও, পায়ের ধুলো—

পাগল আমার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে কি যেন একটা অদ্ভুত ভাব হল। একটা অদ্ভুত আনন্দের ভাব, সে মুখে বলে বুঝিয়ে দিতে পারব না, বিশেষত তখন আমি বালক, বিশ্লেষণ ও তুলনা করে দেখবার ক্ষমতা ছিল না। এখন এক-একবার ভাবি, পাগল ঠাকুরের পায়ের ধুলো নেওয়াটা হয়তো একটা ছুতো—আমাকে স্পর্শ করবার জন্যেই ও পায়ের ধুলো নিতে চেয়েছিল।

তারপর ও একটা গান করলে। গান আমার মনে নেই, কিন্তু বেশ গলার সুর ওর। গান গাইতে গাইতে ওর চোখে জল এল, গাল বেয়ে জল পড়তে লাগল। 'ও আমার হৃদকমলের পরমগুরু সাঁই'—এই কথাটা বার বার ছিল গানের মধ্যে।

গান শেষ করেও বার বার বলতে লাগল—কিছু খাওয়াতে পারলাম না, বাবাঠাকুর। একটা পাকা তাল নিয়ে যাও, বড়া করে দিতে বলো তোমার মাসিমাকে।

আমার ভয় এখন সম্পূর্ণরূপে কেটে গিয়েছিল। আমি বললাম তুমি কি করো এখানে ?

পাগল ঠাকুর হা হা করে হেসে উঠে আমার দিকে চাইল, তারপর সস্নেহ সুরে বললে—বাবাঠাকুরের কথা শোনো ! হাসতে হাসতে মরি যে। খুব আনন্দ জুটিয়ে দিলেন সন্দেবেলা গুরুগোসাঁই। বলে কিনা—কি কর ?আমি এখানে থাকি বাবাঠাকুর, আর কি করব ?গুরু গোসাঁইকে ডাকি।

—কে সে ?

—ওই,ওই—

পাগল আঙুল তুলে আকাশের দিকে দেখিয়ে বললে—উনি।

আমার খুব ভালো লাগছিল এই অদ্ভুত লোকটাকে। এই অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি তার দিকে যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়ে পড়েচি দেখলাম। এই সময় সন্ধের অন্ধকার নামল। গায়ের রোঁয়া আর দেখা যায় না। ও উঠে দোরে জল দিয়ে ধুনো জ্বাললে। উঠোনের একটা ইঁটের মতো উঁচুমতো জায়গাতে প্রদীপ নিয়ে রেখে দিলে। আমি বললাম—তোমাদের তুলসীগাছ নেই ?

—কেন বাবাঠাকুর ?

—আমাদের বাড়ি আছে। মাসিমা পিদিম দেয় সন্দেবেলা।

—তুলসী রাখি নে তো বাবাঠাকুর। গুরুগোসাঁই ওই পিঁড়িতেই আছেন, তুলসী কি হবে ?

—তুমি পুজো করো না বুঝি ?তুলসীপাতা না হলে পুজো হয় না।

পাগল ঠাকুর হেসে বললে—হয় বাবা, হয়। কেন হবে না ?সব ফুলে, সব পাতাতেই তাঁর পুজো হয়। তবে পুজো-আচ্চা আমি করি নে বাবা।

—করো না ?

—না, বাবাঠাকুর। আমি ছোট জাত, বুনো। তেনার পুজো কি কত্তে পারি আমি ?গুরুগোসাঁই পায়ে রাখেন যদি তবে আর পুজোর দরকার কি ?ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজো করবে তোমরা—বাঁওনেরা। আমাদের ছোট জেতের হাতে ও সাজে না। পুজো কত্তে নেই আমাদের।

—তুমি তো ভালো লোক।

—কে বললে আমি ভালো লোক ?

—সবাই বলে, আমি শুনিচি।

—তুমি যখন বলচো বাবাঠাকুর, তখন ভালোই হব।

এই সময় আমার মাসতুতো ভাই ফিরে এসে আমায় ডাক দিল, তার সঙ্গে আমি বাড়ি চলে গেলাম। বাড়ি যাওয়ার আগে ওরা আমাকে তাল দিলে, শস্য দিলে, আবার আসতে বলে দিলে।

পাগল ঠাকুরের সঙ্গে আমার এই প্রথম দেখার পরে প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেল। মাসিমার বাড়ির সেই গ্রামে আমার যাওয়া ঘটেনি এই পাঁচ বছরের মধ্যে।

১৯১৩ সালে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়ে ইস্কুলের ঝক্কি কিছুদিন এড়াবার জন্যে চলে গেলাম আবার মাসিমার বাড়ি।

মাসিমা বললেন—এসো এসো বাবা। বুড়ো মাসিকে ভুলেই গেলে। থাক—থাক—বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও।

আমার মনে আছে, দু-একটা কথার পরে আমি বুড়িকে জিজ্ঞেস করলাম—মাসিমা, সেই পাগল ঠাকুর আছে তো ?

মাসিমাকে 'বুড়ি' বললাম বটে কিন্তু তিনি সত্যিকার বুড়ি এখনো ঠিক নন। যৌবনে তিনি সুন্দরী ছিলেন। আমি যখনকার কথা বলচি তখনো তিনি তত মোটা হননি, বেশ দোহারা সুঠাম চেহারা, ফর্সা রং, বড় বড় চোখ। মাথার চুল কেবল ছোট করে ছেঁটে ছিলেন বিধবা হওয়ার পর। দেহে জরার আক্রমণের কোনো চিহ্ন তখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তার ওপর মাসিমা ছিলেন গ্রাম্য জমিদারের ঘরের বঞ্চু। চাল-চলনে একটা সেকেলে বনেদী ও স্পর্শ-ভীরু ঈষৎ গর্বিত আভিজাত্য সদা-সর্বদা বর্তমান থাকত। মাসিমা তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন—কে ?ও সেই পাগল ঠাকুর—হ্যাঁ, বেঁচে আছে। কেন, তাঁর খোঁজে তোমার কি দরকার ?

এখানে 'তোমার' কথাটার প্রয়োগ যে বিরক্তিসূচক তা আমার বুঝতে দেরি হল না। মাসিমা জমিদারের বাড়ির বউ, তাঁর বোনপো যে তাঁদেরই গ্রামের এক ছোট জাতের গুরুর সঙ্গে মিশবেএটা তাঁর ভালো লাগল না। অবিশ্যি এটুকুও বলা উচিত যে, তাঁরা নামেই তখন জমিদার, কিছুই ছিল না তখন, সংসারে বিষম টানাটানি চলছিল, তাও জানতাম। নতুবা নন্দ জমিদারের ছেলে হয়ে কাঁটাদ'র হাট থেকে বেগুন বয়ে আনবে কেন ফি হাটে ?

মাসিমার প্রশ্নের জবাব দিলাম—আমার কোনো দরকার নেই সেখানে। সেবার আলাপ হয়েছিল, তাই বেঁচে আছে কিনা জানতে চাইচি।

—বাঁচবে না তো যাবে কোথায় ?

—মেলা হয় ?

—পাগল ঠাকুরের মেলা ?কেন হবে না, যত বেটা বুনো বাগদির গুরুদেব, শুধু ব্যাটারা এসে পায়ের ধুলো নেয়, হৈ-হল্লা করে। ঝাঁটা মারো ! গুরু—গুরু ! গুরু এমনি গাছের ফল কিনা।

আমি কিন্তু বিকেলেই পাগল ঠাকুরের বাড়ি গিয়ে হাজির। সেবারকার সেই প্রথম দর্শনের স্মৃতি আমার বালক-মনে একটি রহস্যজনক স্থান অধিকার করে আছে তখনো। আবার তাদের সেই দুখানা খড়ের ঘর, নিকোনো পুঁছোনো গোবর-লেপা উঠোন, ঝিঙের-ফুল-ফোটা গঙ্গার তীরে অপরাহ্ন শোভা কতকাল পরে দেখলুম।

পাগল ঠাকুরের দাড়ি আরো সাদা হয়ে নারদ মুনির মতো দেখতে হয়েচে। তবে বার্ধক্যজনিত কোনো শীর্ণত্ব বা দৌর্বল্য নেই শরীরে। খুব শক্তসমর্থ, লাঠি-লাঠি চেহারা। মুখে সেই হাসি। এবার আর আমি নিতান্ত বালক নেই। অনেক জিনিস বুঝি। আগের ভয় আর নেই।

বললাম—তোমাকে বড় ভালো লেগেছিল সেবার—বড্ড মনে হত তোমাকে—

হেসে বললে—গুরু গোসাঁইয়ের কৃপা বাবাঠাকুর, তুমি যে পতিতপাবন, পতিতকে উদ্ধার করতে আসবা না ?

—ওসব কথা আমায় বলতে নেই। তুমি আমার নাম মনে রেখেচ যে দেখচি !

—তুমি আমায় মনে রেখেছিলে, তাই আমিও তোমার কথা মনে রেখেছিলাম। আয়নায় মুখ দেখা যে বাবাঠাকুর। যেমন দেখাও তেমনি দেখি।

—একটা গান করো—

ওকে আর দ্বিতীয়বার খোশামোদ করতে হল না। সেবারকারের সেই বৃদ্ধাকে দেখলাম এবার। তাকে ডেকে বললে—একতারাটা দ্যাও তো। পতিতপাবন ঠাকুরকে একটা গান শোনাই—কিন্তু বাবা, একটা কথা বলি ?

বলে সে হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলে।

আমি বললাম—কি ?

একটা আলাভোলা, অসহায় ধরনের অনুরোধ যেন করচে, এমনিভাবে বললে—আমি যেমন তোমায় গান শুনিয়ে গেলাম, তুমি পতিত উদ্ধার করতে এমনিধারা আসবা তো...বলি হ্যাঁগা, ও ঠাকুর ?...

নাঃ, ও পাগলামি শুরু করেচে আবার ! কাকে কি বলে যে !

পাগল ততক্ষণ একতারা বাজিয়ে গান শুরু করে দিয়েচে—

ও আমার হৃদ্-কমলের পরম গুরু সাঁই,
রেতে আলো দিনে তারা রাত নাই দিন নাই।
তোমার সেথা বাঁশের ঝাড়ে
অরূপ রূপের পাথার পাড়ে
বাঁশের ফুলে ভুবন আলো দেখতে এলাম তাই।
চলার পথে বাদল দিনে তোমার সেই
বাঁশতলাতে দিয়ো ঠাঁই,
ও আমার হৃদ্-কমলের পরম গুরু সাঁই...

সেই ছেলেবেলার শোনা গানটা।...ওর গান গাওয়ার ধরনটা আমার বেশ লাগে। চোখ উল্টে উদাস-নেত্রে ওপরপানে চেয়ে—সে ভাবই আলাদা। গলা ভালো নয়, ভাঙা গলা, দুটো বেসুরো সুর যেন গলা থেকে বেরিয়ে আসচে—তাই কি, চোখ দিয়ে যখন ওর দরদর জল নেমে এল, তখন আমাদের গ্রামের বিখ্যাত যাত্রার জুড়ি দাশু পরামানিকের চেয়েও ওকে সুকণ্ঠ বলে মনে হল।

আরো একটা, তারপর আর একটা। সরাটির চরে ঝিঙে-ফুল ফুটেছিল সেবার, ঝিঙে-ফুলের হলুদ ক্ষেত আর পাগল ঠাকুরের গানের ক্ষ্যাপাটে সুর একতারে বাঁধা। ধু ধু সরাটির চরে, নির্জন সরাটির চরে ঘুলি-ঘুলি আধ-অন্ধকারে কেউ ঝিঙের ফুল ফুটতে দেখেছিলে ত্রিশ বছর আগের এক ভাদ্র সন্ধ্যায় ?তা হলে পাগল ঠাকুরের গান বুঝতে পারবে।

আমি একমনে শুনছি। হঠাৎ গান থামিয়ে ও বললে—কি খাবা ?

—কিছু না।

—সে বললে হবে কেন ?আমারে পেরসাদ দেবে এখন কে ?

—আমি খেতে আসিনি তোমার কাছে। তোমাকে দেখতে এসেচি। পাঁচ বছর পরে এলাম।

পাগল ঠাকুর বিস্ময়ের সুরে বললে—পাঁচ বছর হয়ে গেল এরি মধ্যে ! কি জানি, দিন রেতের হিসেব তো রাখি নে। হ্যাঁ, তা তুমি অনেক বড় হয়ে গিয়েচ বাবাঠাকুর। তখন ছিলে এত বড়—ওগো শোনো—

সেই বুড়ি কাছে এসে বললে—কি বলচো ?খোকাবাবু কে ?

আমি বললাম—চিনতে পারলে না ?সেই এসেছিলাম পাঁচ বছর আগে ! নন্দর মাসতুতো ভাই, আমার নাম পতিতপাবন।

—বাবাঠাকুর, বড় খুশি হলাম তুমি এয়েচ। আর চোখে ঠাওর হয় না আগেকার মতো। ভালো আছ ?

—হ্যাঁ, তা আছি। এখন ইস্কুলে পড়চি—এবার থার্ড ক্লাসে উঠেচি ফার্স্ট হয়ে।

—তা হবে। তোমাদের সব ভালো হোক, গুরু-গোসাঁইয়ের দয়ায় সব নিরুগী হয়ে থাকো।

পাগল ঠাকুর বললে—ঘরে কিছু আছে ?বাবাঠাকুরের সেবায় লাগাও।

আমার দুর্বল প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেবা-লাগানোর কাজে এল একটি পাকা পেঁপে। আমি খাচ্চি, ও হাত পেতে বালকের মতো সুরে অথচ নারদ মুনির মতো দাড়ি নিয়ে আমার ঠাকুরদাদার বয়সী লোক নিঃসঙ্কোচে বললে—দ্যাও একখানা।

দিলাম। যেন আমার সমবয়সী খেলুড়ে। বললাম তোমার এখানে থাকতে ভালো লাগে।

পাগল ঠাকুর হেসে বললে—তোমাকেও যে আমার রাখতি ভালো লাগে। থাকবা এখানে ?

—ইচ্ছে তো করে। বাড়ির লোকে থাকতে দেবে না যে।

পাগল ঠাকুর একটা মাটির পাত্র থেকে গুড় তুলে নিয়ে দা-কাটা তামাক মাখলে বসে বসে। একটা কল্কে ভরে তামাক সেজে হাতে করেই টানতে লাগল। নিজেই একটা হাঁড়ি চড়ালে উঠোনের এক উনুনে।

আমি বললাম—হাঁড়িতে কি হবে ?

—বাবাঠাকুর, ক্ষিদে পেয়েচে, কিছু খাব। দুটো চাল দিয়ে যাও গো—

হাঁড়িতে একখুঁচিটাক মোটা রাঙা আউশ চাল ফেলে দিয়ে একটু পরে বড় বড় গোটাকতক পাকা যজ্ঞিডুমুর সামনের জঙ্গলের থেকে পেড়ে নিয়ে আঠাসুদ্ধুই ফেললে হাঁড়িতে। আমি বসে বসে ওর খাওয়ার মজা দেখচি। ও আবার আমার পাশে বসে তামাক খেতে লাগল। আমায় বললে—বাবাঠাকুর, ওপারের বুনোপাড়া উচ্ছন্নে গেল ওলাউঠোতে। রোজ সেখানে যাই, সারাদিন থাকি, এই খানিকটা আগে এইচি, তাই বড্ড ক্ষিদে পেয়েচে।

—সেখানে কি করো ?

—আমি কি কিছু করি ?তিনি—গুরু-গোসাঁই করান। যাদের কেউ নেই, আমার অকেজোহাত দিয়ে তিনি তাদের মুখে জল দেন, ওষুধ দেন। আমার হাত ধন্য হয়ে গেল, আমার হাত না দিয়ে অন্য কারো হাত নিলেই পারতেন। তেনার কৃপা।

—গুরু-গোসাঁই কে, আজ বলতে হবে।

—ওই যে উনি—নিরাকার, সব ঘটে আছেন যিনি। তাই তো তুমি আমার পতিতপাবন ঠাকুর। তুমিও যা, তিনিও তা—তোমার মধ্যেই তিনি। যারা রুগী, ওলাউঠোয় বমি করচে, হলদে হয়ে গিয়েচে চোখের শির, হাতেপায়ে খিঁচুনি ধরেচে, গলা ঘড়ঘড় করচে—তাদের মধ্যে জনায় জনায় তিনি। তিনি উঁকি মারেন ওদের চোখের মধ্যে থেকে। বেশ দেখতে পাই—বমি ঘাঁটি, ঘেন্না আসে না, মনে হয় গুরু-গোসাঁইয়ের সেবা করচি। খেলা, সব তাঁর খেলা। তাঁর আবার রোগ ! লীলা !

—আমায় নিয়ে যাবে বুনোপাড়ায়, তোমার সঙ্গে যাব ?

—ওরে বাবা রে ! অমন কচি সুন্দর নতুন হাত বমি ঘাঁটবার জন্যে নয়। তার এখন দেরি আছে, ও সবের জন্যে তাড়াতাড়ি কি ?পড়ো, এখন খুব মন দিয়ে পড়ো।

একটু পরে ও ভাত নামালে। একটা আঙট কলার পাতে ঢেলে যজ্ঞিডুমুরগুলো টিপে টিপে নুন তেল দিয়ে মাখলে। আমায় বললে—কিছু মনে কোরো না বাবাঠাকুর, আমি খাই। হুকুম করো—

আমার অনুমতির প্রয়োজন কি, বুঝলাম না। তবু বললাম—বারে, খাও, আমি কি বলব ?খাও—শুধু ডুমুর-ভাতে খেতে পারবে ?

—কেন পারব না, বাবাঠাকুর ?একটা যা হয় হলেই হল। জিবের সুখ যত বাড়াবে, ততই বাড়ে। ওর মধ্যে কিছু নেই। কে হাট-বাজারে ছোটে দুটো খাওয়ার জন্যে ?জঙ্গলে গুরু-গোসাঁই সব করে রেখেচেন। ডুমুর আছে, তেলাকুচো ফল আছে—

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম—তেলাকুচো ?

—হ্যাঁ বাবাঠাকুর, তেলাকুচো ভাতে খাও, ভাজা খাও, তেলাকুচোর পাতা ভাজা খাও—দিব্যি জিনিস। পেয়ারা-ভাতে-ভাত খেয়ে একমাস কাটিয়ে দিই। উঠোনে ওই দ্যাখো পেয়ারা গাছ। পেয়ারা হয়নি, তাহলে তোমায় দিতাম। কেন যাব বলো হাটে-বাজারে ?

—তোমার উঠোনে তরি-তরকারি কর না কেন ?

—বড্ড খাটতে হয় ওর পেছনে। ঝঞ্ঝাট। কে অত ঝঞ্ঝাট করে ?সে সময়টা গুরু-গোসাঁইয়ের নাম নিলে কাজ হবে। ওই শসার গাছ করা হয় শুধু গুরু-গোসাঁইয়ের সেবার জন্যে।

পাগল ঠাকুর খেয়ে উঠে এঁটোপাতা ফেলে দিলে। রাজ্যির কুকুর জড়ো হয়েছিল আগে থেকে, পাতের অনেকগুলো ভাত ওদের সামনে ছড়িয়ে দিলে।

আবার তামাক সাজতে বসল। তামাক খেতে খেতে বুড়িকে বললে—পাকাটি দ্যাও গোটাকতক, একটা মশাল করি।

আমি বললাম কি হবে ?

—এখুনি আবার বুনোপাড়ায় যেতে হচ্চে। দুটো রুগী এড়িয়ে আছে, দেখে এসেচি। তাদের ফেলে থাকতে পারব না। নবীন ডাক্তারকে বলে এসেচি যাবার জন্যে। এখন গুরু-গোসাঁইয়ের কৃপা হলে সেরে উঠতে পারে। আর তিনি যদি চরণে টানেন—তবে হয়েই গেল—আহা-হা !

ওর চোখে প্রায় জল এসে পড়ল। আমার হঠাৎ বড় উদ্বেগ হল ওর জন্যে। ও যেন আমার আত্মীয় কত কালের। আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম—তুমি যেয়ো না সেখানে। যদি তোমার হয় ?বড় খারাপ রোগ—

পাগল ঠাকুর হেসে বললে—ওই দ্যাখো, বাবাঠাকুরের কথা—তাঁর নিয়ে সব, তাঁর যদি ইচ্ছে হয় এই খোলসটা বদলাব, তবে তাই হবে। তিনি যেখানে নিয়ে যাচ্চেন সেখানে যেতেই হবে। আমি তো যাচ্চি নে, তিনি নিয়ে যাচ্চেন,—তাই যাচ্ছি। আমি কেউ নই।

একটা অদ্ভুত ভাব ওর মুখে ফুটে উঠল কথা ক'টা বলবার সময়। বুড়ি বললে—রাত্তিরে ফেরবা তো ?

ও বললে—তা বলা যায় না। তুমি ঝাঁপ খুলে রেখো, আসি তো ঝাঁপ খুলে ঢুকব। চলোবাবাঠাকুর, সন্দে হয়েচে, তোমায় পৌঁছে দিয়ে ওই পথে চলে যাই।

আমি বললাম, আমায় এগিয়ে দিতে হবে না, একাই যেতে পারব। কারণ মাসিমা টের পেয়ে যাবেন যে আমি এতক্ষণ কোথায় ছিলাম। তিনি পছন্দ করবেন না আমার এখানে আসা-যাওয়াটা। মনে মনে তা আমি জানি। সুতরাং কত্‌বেলতলা দিয়ে একাই বাড়ি চলে গেলুম। মাসিমাকে পাগল ঠাকুরের কথা কিছু বলিনি। তিনি নিজেই জিজ্ঞেস করলেন—ওদিকে গিইছিলি নাকি ?

—কোন্ দিকে ?

—পাগল ঠাকুরের আখড়ায় ?

—হ্যাঁ। একটু বসে ছিলাম। বেশ ভালো লোক। কোথায় কলেরা হয়েচে, নিজে গিয়ে তাদের সেবা করচে রাত্তির বেলাতে।

—হুঁ।

ঐ পর্যন্ত। উনি চুপ করে গেলেন, বুঝলুম না রাগ করলেন কিনা।

তার পরদিন আবার বিকেলে পাগলের আখড়ায় গিয়ে হাজির হই। কিসের একটা টান অনুভব করলাম, না গিয়ে থাকা গেল না।

পাগল ঠাকুর আপনমনে বসে গান করছিল একখানা তালপাতার চেটাই পেতে। ওর গানই ওর উপাসনা, ওর মুখে গান শুনলেই আমার তা মনে হয়েচে। আমার বয়েস কম হলেও আমি তখন অনেক বুঝি। ওর মতো ভক্তি আমি কারো দেখিনি। মাসিমাকে বাড়ি ফিরে কথাটা আমি বলেছিলাম। মাসিমা গীতা নিয়মিত পাঠ করতেন, রামায়ণ মহাভারত তাঁর বড় প্রিয় ছিল, ব্রত উপবাস করতেন, রোজ ভোরে গঙ্গাস্নান করে পুজো-আচ্চা করতেন বেলা নটা পর্যন্ত। কৃষ্ণ ঠাকুরের ছবিতে চন্দন মাখাতেন, ফুল দিতেন। পাগল ঠাকুর ওসব কিছু করে না অথচ সে ভক্তলোক, এ কথা মাসিমা বুঝবেন না। তবুও মাসিমা মন দিয়ে কথাটা শুনলেন, শুনে চুপ করে রইলেন।

পাগল ঠাকুরকে বললাম—কখন এলে কাল রাত্তিরে ?

—সারারাত ছিলাম বাবাঠাকুর। দুটোই মারা গেল, শ্মশানে তাদের ভাসিয়ে দিতে।

—পোড়ালে না ?

—গরিব লোকদের পোড়াচ্চে কে বাবাঠাকুর ?কাঠকুটো কোথায় ?গুরু-গোসাঁইয়ের নামে গঙ্গার বুকে ভাসিয়ে দিলাম—আর ভাবনা কিসের ?দেহটা হাঙ্গর-কুমিরে খেলেও দেহ দিয়ে জীবের উপকার হল। পুড়িয়ে দিয়ে ফল কি, বলো ?ওদের একটা ছেলেকে নিয়ে এলাম আমার এখানে। ওই দ্যাখো, কাঠ কুড়িয়ে আনচে, ছোট ছেলে, কেউ নেই—গুরু-গোসাঁই তাই আমার ঘাড়েই চাপালেন। তাঁর হুকুম।

ও এমনভাবে কথা বলচে যেন ভগবান ওর সঙ্গে পরামর্শ করেন সব কথায়, আমার হাসি পেল। যা হোক, ওর মন ভারি সরল।

আমাকে ওই পাগল ঠাকুর ভয়ানক বেঁধেচে, ক্রমে বুঝচি। বিকেল হলে আসতেই হবে যেন ওর এখানে। ও আমাকে কিছু খেতে দেবে, তারপর গান শোনাবে। কোনো বৈষয়িক কথা ওর মুখে শুনিনি। অনেক পরে বয়েস হলে এ সব ভালো করে বুঝেছিলাম।

আমি বললাম—তুমি মাছ ধরো ?

—না, বাবাঠাকুর।

—তোমার বাড়ি কোথায় ছিল ?

অন্য লোক হলে এ কথার উত্তর দেয় না। কিন্তু পাগল ঠাকুরের মতো সরল লোকের কোনোকিছুই গোপনীয় নেই। সে বললে—শঙ্করপুর। কাঁচড়াপাড়ার ওদিকে, এখান থেকে আট-ন কোশ।

—বাড়ি-ঘর আছে সেখানে ?

—কিছু নেই। আমরা গরিব লোক, খড়ের কুঁড়ে ছিল, ভেঙে গিয়েচে, ভিটেতে কিছু নেই—মস্ত এক তালগাছ হয়ে আছে, সেবার দেখে এসেছিলাম।

—আপনার জন কেউ নেই ?

—এই যে বাবাঠাকুর, ভুল কথা বললে। আপনার জন নেই কেন, এই তুমিই তো আমার আপনার জন ! গুরু-গোসাঁই সবাইকে আপন করে দিয়েচেন যে ! ক'দিন থাক ?

—আর দুদিন ছুটি আছে মোটে।

—মোটে দুদিন ?তারপর চলে যাবা ?দুঃখু দিতে আসো কেন বলো তো ! তুমি চলে গেলে আমার বড্ড কষ্ট হবে দিন-কতক। বিকেলটা কাটবে না। গুরু-গোসাঁইয়ের ইচ্ছা...

বলে সে দীর্ঘশ্বাস ফেললে। সেই মুহূর্তে ও আমার বড় কাছে এসে পড়ল, আর দূরের লোক রইল না।

বাকি দুদিনও রোজ বিকেলে ওখানে যাই। বুনোদের সেই ছোট ছেলে এরই মধ্যে নিজের হয়ে গিয়েচে। সে দেখি রান্নাঘরে আউশ চালের পান্তাভাত বেগুনপোড়া আপনিই হাঁড়ি থেকে বেড়ে নিচ্চে দিব্যি, নিজের ঘরের মতো।

পাগল ঠাকুর আমায় নিয়ে ছোট ঘরের দাওয়ায় বসে আর গান করে। একতারা বাজিয়ে ওর বেসুরো গলায় যখন গান করে, তখন প্রতিদিন এই গঙ্গার চরে কোনো বিরাট দেবের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করি...ওদিকে বিষ্ণুপুর গ্রামের বাঁশবন, ঘোষপাড়ার বাবুদের লিচুবাগান—সব কেমন অদ্ভুত মনে হয়, সরাটির চরের কাশবনের পেছনে মস্ত আকাশটা লাল হয়ে ওঠে অস্তসূর্যের আভায়।

আমার অল্প বয়েস বলেই হোক বা যে জন্যেই হোক, কি অদ্ভুত টান যে হয়ে উঠেছিল পাগল ঠাকুরের ওপর ! এখন মনে ভাবলে আশ্চর্য হই। বাল্যের সে কয়টি দিনের আনন্দ আর ফিরে পাব না, তেমন ধরনের আনন্দও আর পাইনি কখনো।

পাগল ঠাকুর গান থামিয়ে একতারা নামিয়ে রেখে একগাল হেসে বললে—আনন্দ করো, আনন্দ করবার জন্যেই একপাশে পড়ে আছি। গুরু-গোসাঁইয়ের দয়ায় শুধু আনন্দ নিয়ে আছি।

ওর হাসিভরা উজ্জ্বল চোখ দুটি আর নারদের মতো সাদা দাড়ি, শিশুর মতো সরল মুখ ওর কথার সত্যতা সপ্রমাণ করত...সেই আনন্দ ছোঁয়াচে রোগের মতো পেয়ে বসত সবাইকে, যে ওর সংস্পর্শে আসত।

এর একটা উদাহরণ মধ্যে একদিন প্রত্যক্ষ করলাম। কোথা থেকে একদল মেয়ে-পুরুষ ওর ওখানে এল। বোঁচকা-বুঁচকি এক-একটা পিঠে বাঁধা। শুনলাম ওরা পাগল ঠাকুরের শিষ্য। এই যে মাসিমা বলেন, ছোট জেতের গুরু !

কিন্তু গুরুর মতো সম্ভ্রমসূচক ব্যবহার করে ওরা দূরে রইল না। সবাই একসঙ্গে বসে তামাক খেলে হাতে হাতে কল্কে পরিবেশন করে। পাগল ঠাকুরের চারিদিকে গোল হয়ে বসে একতারা বাজিয়ে গান করলে, হাসিখুশি আনন্দ, খাওয়া-দাওয়া। ওদের মুখ দেখে মনে হল জীবনে ওদের কোনো দুঃখকষ্ট নেই। খাওয়া-দাওয়া তো ভারি, পাগল ঠাকুরের ভাণ্ডার কারো আপন নয়, অথচ যার যা খুশি নিজের হাতে চাল বার করে নিচ্চে, বুনোপাড়া থেকে দুটো রাঙা শাকের ডাঁটা নিয়ে এল, ডুমুর পাড়লে—চড়ালে ভাত, নুন ছড়িয়ে সবাই আঙট কলার পাতায় ভাত ঢেলে একসঙ্গে খেলে, গুরুও বাদ গেলেন না। দিনটা আনন্দ করে সন্দের দিকে সবাই বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে চলে গেল।

আমিও চলে এলাম তার পরের দিন।

এরপরে আবার সে গ্রামে যাই যেবার ম্যাট্রিক পাস দিয়ে কলেজে ঢুকেচি।...মাসিমা আগের চেয়ে বৃদ্ধা হয়ে পড়েচেন, চোখে ভালো দেখতে পান না।

বললাম—পাগল ঠাকুর বেঁচে আছে ?

মাসিমা বললেন—আছে না তো যাবে কোথায় ?তোমার বুঝি সেখানে যাওয়া চাই-ই ?আহা, কি যে দেখেচ ওর মধ্যে তুমি ! ছেলেবেলা থেকে দেখে আসচি এই কাণ্ড—

পাগল ঠাকুরকে অন্য চোখে দেখলাম। সেই ছোট খড়ের ঘরের আশ্রম, সেই সদানন্দ সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ, সব তেমনি আছে। চার বছর আগের মতো চেহারাই আছে, বিশেষ কোনো পরিবর্তন নেই। আমাকে দেখে বললে—বাবাঠাকুর যে, আরে এসো এসো, তোমার কথা কত বলি ! কবে এলে ?

—আজই। তুমি ভালো আছ ?

—গুরু-গোসাঁইয়ের কৃপায় আছি ভালোই। বসো, গান শোনবা ?

—গান শোনবার জন্যেই তো আসা।

—শসা খাবা না ছেলেবেলাকার মতো ?

—না, শোনো, এখন আর ছেলেমানুষ নই। তুমি যা খুশি খেতে দিতে পারো, ভাত পর্যন্ত। ছেলেমানুষ নই আর, কারো এন্তাজারির মধ্যে নেই এখন। তোমার এখানে খাব, তাতে দোষ কি ?রাঁধো না তেমনি ডুমুর-ভাতে-ভাত ?

পাগল ঠাকুর ভয়ের ভান করে হেসে বললে—ও বাবারে, বাঁওনের জাত মেরে দিই এই সন্দেবেলা। তা হবে না—আর কি খাবা বলো ?ওগো শোনো ইদিকে—এঁকে চেনো ?সেই যে—

বুড়ি কুঁজো হয়ে পড়েচে আরো, চোখেও ভালো দেখে না মনে হল। কাছে এসে বললে—কে ?

—ওই সেই যে ভূপেনবাবুদের বাড়ির ছেলেটি কত বড় হয়েচে আর কি চমৎকার দেখতে হয়েচে দ্যাখো। শোনো, দুটি চাল আর কাঁঠালবীচি ভাজা ভেজে নিয়ে এসো তো, খেতে দিই। চা খাও বাবাঠাকুর ?চা করে দিতে পারি। একজন এখানে চা রেখে গিয়েচে, সে মাঝে মাঝে এসে চা খায়। খাবে ?

—করো।

চা করতে গিয়ে ওরা দুজনে বিষম বিপদে পড়ল। বুড়ো-বুড়ি নানা পরামর্শ করে, একবার জল ফোটায়, আবার নামায়—আধঘণ্টা হয়ে গেল, রান্নাঘর থেকে বেরোয় না। কাঁসার ঘটিতে গরম জল আর চা একসঙ্গে গুড় সহযোগে সিদ্ধ করে অবশেষে এক ব্যাপার করে নিয়ে এল, সবাই মিলে অর্থাৎ তিনজনেই মহাআনন্দে তাই পান করা গেল।

তারপর তামাক সাজতে সাজতে বললে—এইবার কি খবর বলো বাবাঠাকুর—

—তোমায় দেখতে এলাম।

—আমায় কি আর দেখতে আসবা ?ভালোবাসো তাই; নইলে আমি কি একটা দেখবার মতো লোক ?

জানো, তোমাকে একজন দার্শনিক বলে মনে হয় ?

—সে কি বাবাঠাকুর ?

—আমার মনে হয় তুমি একজন দার্শনিক। সত্যিকার দার্শনিক—ঋষির মতো লোক। তোমাকে লোকে চেনে না।

—ওসব কথা আমায় বলো না। আমাকে তিনি পায়ের দাস করে রেখেচেন। তাঁর দয়া। আমার কোনো গুণ নেই, বাবাঠাকুর। আনন্দে রেখেচেন, আনন্দে আছি। গান শোনো—

আমার চোখ অনেকটা খুলেচে আগেকার চেয়ে। বৃদ্ধের সরল পবিত্র মুখভাব আর সহজ আনন্দ ওকে আমার চোখে ঋষির পদবীতে উঠিয়ে দিয়েচে।

পাগল ঠাকুর যদি ঋষি নয়, তবে ঋষি কে ?লেখাপড়া জানলে, আর দু-তিন হাজার বছর আগেকার ভারতবর্ষের লোক হলে এই লোকেই উপনিষদ রচনা করত—সরাটির চরের মতো উদারহত তার বাণী, ঝিঙে-ফুলের সৌন্দর্য থাকত তার ভাষায়, সন্ধেয় সকালে বাঁশবনের পক্ষীকূজনের মতো শান্ত সহজ আনন্দ মিশিয়ে থাকত তার অঙ্গে অঙ্গে।

কিন্তু একে কেউ চিনলে না।

আমার সারাজীবন ওর দত্ত সহজ আনন্দের মন্ত্রে দীক্ষিত। যেবার বিবাহ করে মাসিমাকে নববধূ দেখাতে গিয়েছিলাম ওঁদের গ্রামে, ভেবেছিলাম পাগল ঠাকুরের ওখানেও নিয়ে যাব, আসল উদ্দেশ্য ছিল সেটাই—কিন্তু পাগল ঠাকুরকে আর দেখতে পাইনি।

সেও এক বিকেলে গেলাম ওর আখড়াতে। বাবলা গাছের তলায় ওর সমাধি। ওদের সম্প্রদায়ে নাকি সমাধি দেওয়াই নিয়ম। মাটির একটা লম্বা ঢিবি, বাবলাফুল ঝরে ঝরে পড়েচে তার ওপর। কোনো শিষ্য কতকগুলো দোপাটি ফুলের গাছ রোপণ করে দিয়েচে মাটির ঢিবিটার চারিপাশে—পাগল ঠাকুরের নশ্বরদেহের হাড় ক'খানা ওরই তলায় মাটি মুড়ি দিয়ে আছে।

ওকে এখানকার কেউ চিনলে না। আমার মাসিমা তো এত গীতাপাঠ করেন, মন্ত্রজপ করেন, তিনিই বলেন—হ্যাঁ বাবু, তোমার সেই পাগল ঠাকুর আজ বছর দুই হল মারা গিয়েচে। কে জানে, ওসব ছোটলোকের খবর রাখি নে, রাখবার সময়ও পাই নে—

সেই বুড়ি কেবল বেঁচে আছে আজও। তাকে সন্ধের পিদিম জ্বালতে দেখলাম সমাধির সামনে। রেড়ির তেলের মাটির পিদিম। খড়ের ঘরের খড় উড়ে পড়েচে। আখড়ার অবস্থা অতি খারাপ, কারো দৃষ্টি নেই এদিকে মনে হল। সংসারে এমনিই হয়।